গবেষণায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ

ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম

ডাঃ মোঃ জাকির হাসান

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী

ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ

ডাঃ ইউশা ইসলাম

ড. মোঃ শওকত মাহমুদ

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

টেলিফোন: ০২-৭৭৯১৬৯০, ফ্যাক্স: ০২-৭৭৯১৬৭৫

ই-মেইল: mgias04@yahoo.com, ওয়েবসাইট: www.blri.gov.bd

বিএলআরআই প্রকাশনা নম্বর : ৩১৪

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল

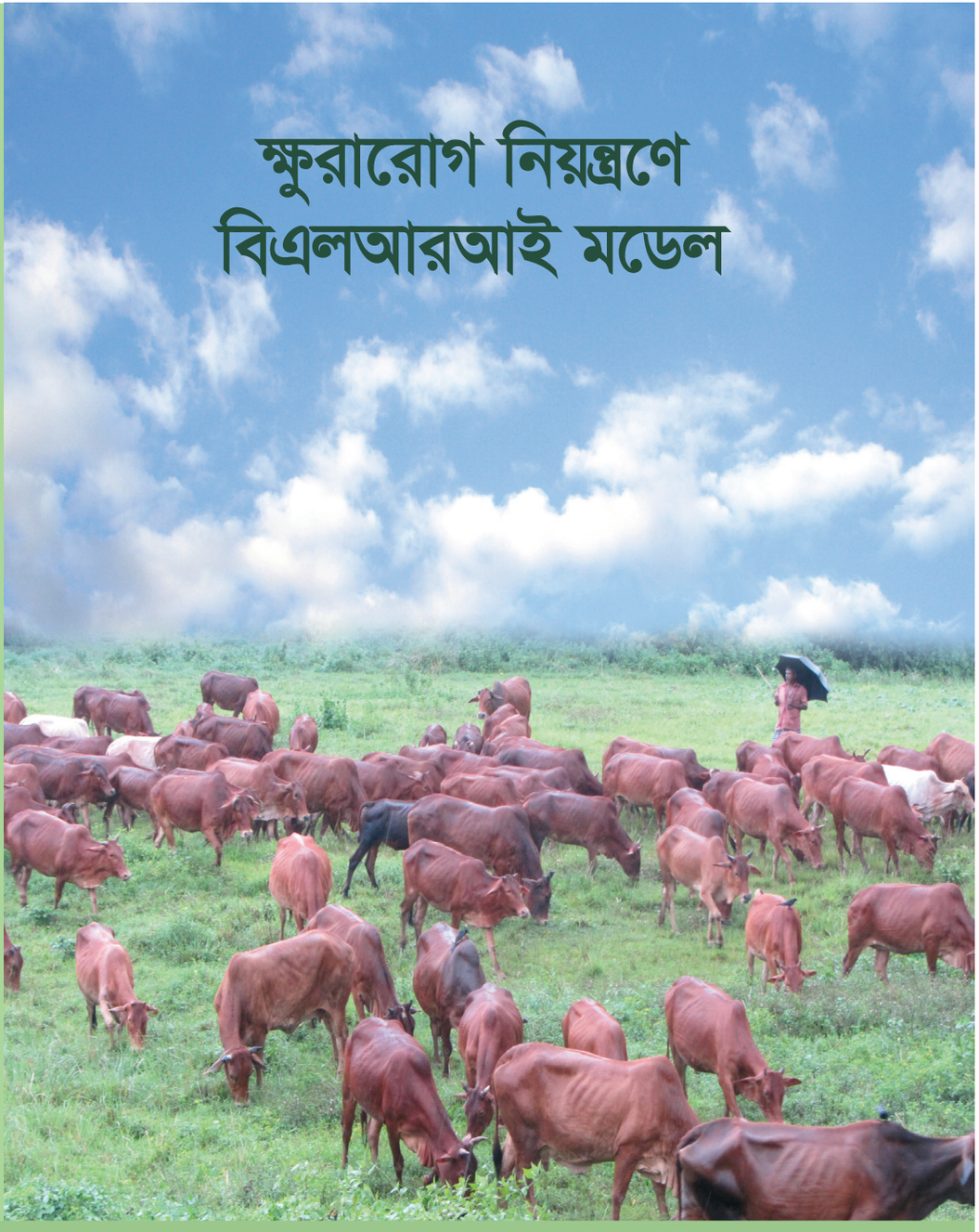

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা।

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল

ভূমিকা

ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এ রোগকে ক্ষুরাচল বা বাতনাও বলে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ রোগটিকে সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রাণী রোগ সংস্থা (OIE) নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষুরারোগ এ (A) গ্রেড ভুক্ত একটি রোগ। এ রোগের ভাইরাস আক্রান্ত প্রাণী হতে ৫০-৭০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী সংবেদনশীল প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে গরুতে এ রোগে আক্রান্তের হার শতকরা ৩৫ ভাগ, মহিষে শতকরা ২৩ ভাগ, এবং ছাগল ও ভেড়ায় শতকরা ৫ ভাগ। ক্ষুরারোগে আক্রান্ত বয়স্ক প্রাণীতে মৃত্যুর হার কম হলেও মহামারী এলাকায় আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এ রোগ হলে প্রায়ই গর্ভপাত হতে দেখা যায় এবং পরবর্তী গর্ভধারণে সমস্যা দেখা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন অনেক কমে যায়। ক্ষুরারোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে, প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪°-১০৫° সে. উঠে যায়, জিহ্বা ও ক্ষুরের মাঝখানে ঘা, জিহ্বার উপরিভাগের

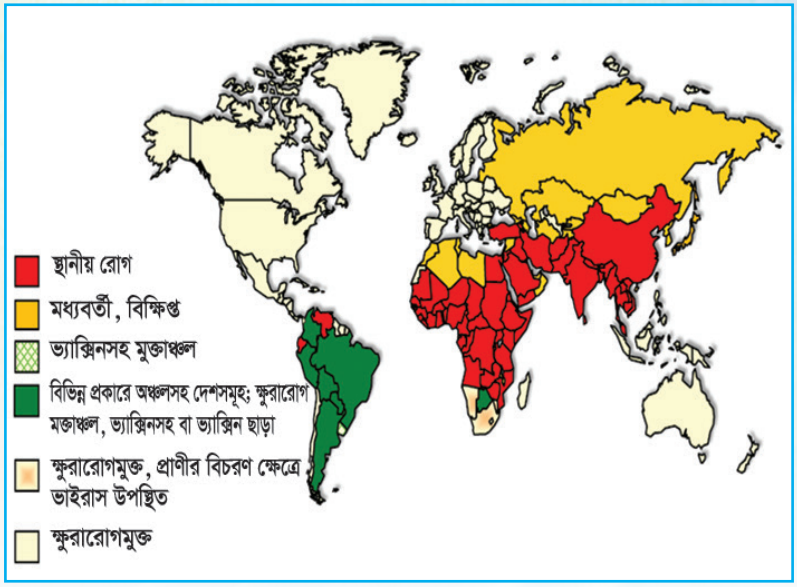

চিত্র: বিশ্বে ক্ষুরারোগের বিস্তার এবং আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চলসমূহ

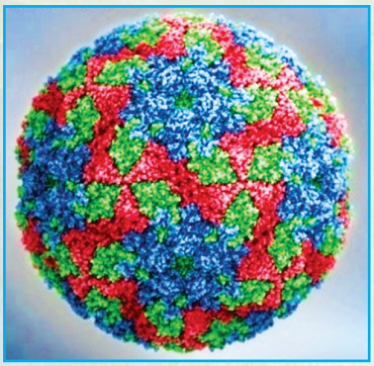

চিত্র: ক্ষুরারোগের ভাইরাস

খোলস উঠে যাওয়া এবং সাবানের ফেনার মতো মুখ দিয়ে লালা ঝরা অন্যতম।

ক্ষুরারোগ এপথো-ভাইরাস (Apthovirus গড়) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র (২২-৩০ এনএম) ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। বিশ্বে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের ৭টি সিরোটাইপ সনাক্ত হয়েছে। প্রতিটি সিরোটাইপের আবার অনেকগুলি সাব-টাইপ রয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩টি সিরোটাইপ (A, O ও Asia-1) বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে সাবলিনিয়েজ Ind 2001 BD1 এবং Pan Asia লিনিয়েজটি বিরাজমান।

চিত্র: ক্ষুরারোগে আক্রান্ত অঙ্গসমূহ

চিত্র: ক্ষুরারোগে আক্রান্ত মৃত বাছুর

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে বর্ষা এবং শীতকালে ক্ষুরারোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। এ রোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ ১২০০০ কোটি টাকারও বেশী বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। সংকর

জাতের গরুতে এ রোগের সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। এ রোগের কারণে প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ ও জাত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষুরারোগ ভাইরাসটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এর এক সিরোটাইপ দ্বারা তৈরী ভ্যাকসিন অন্য সিরোটাইপ দ্বারা সৃষ্ট রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে কৌশলগত ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এই রোগ দমনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প' এর মাধ্যমে FAO/ OIE নির্দেশনা অনুসরণ করে কৌশলগত ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

ক্ষুরারোগ ভাইরাসের সিরোটাইপ

ক্ষুরারোগ প্রকল্পের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি সিরোটাইপ (যেমন-A, O ও Asia-1) বিচরণ করছে। গত প্রায় এক যুগ ধরে এ অঞ্চলে (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মায়ানমার) সিরোটাইপ-C পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সিরোটাইপ O এর সংক্রমণ (৬০-৭০%) দেখতে পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন এক সিরোটাইপের ভ্যাক্সিন প্রাণীকে দেওয়া থাকে তখন অন্য দুইটি সিরোটাইপ (A ও Asia-1) এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় মহামারী এলাকায় সিরোটাইপসমূহের মিশ্র ইনফেকশনও দেখা যায়।

ক্ষুরারোগমুক্ত অঞ্চলের ধারণা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের দেশ থেকে ক্ষুরারোগ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে এবং কিছু কিছু দেশ সে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা প্রদেশ ক্ষুরারোগমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। এ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা অন্য ভাইরাসের চেয়ে বেশী বিধায় এই রোগমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সে দেশের কয়েকটি প্রদেশকে ক্ষুরারোগ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে ব্রাজিল ভ্যাক্সিনসহ ক্ষুরারোগমুক্ত অঞ্চল ঘোষণার মাধ্যমে মাংস রপ্তানির সুযোগ তৈরী করছে। ঐ সকল দেশের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক প্রাণী রোগ সংস্থা (OIE)-র নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে এই বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।

চিত্র: প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ

ক্ষুরারোগ দমন মডেলটি প্রয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

১। এলাকা নির্বাচন: একটি এলাকা (গ্রাম, ইউনিয়ন বা উপজেলা) ক্ষুরারোগমুক্ত করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকাটি নির্বাচনের সময় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের (Natural barrier) উপস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন কোনো নদী বা খালকে এলাকার সীমানা হিসাবে বিবেচনায় আনতে হবে। কৃত্রিমভাবে প্রতিবন্ধক তৈরী করেও এই মডেলটি প্রয়োগ করা যায়।

নির্বাচিত এলাকার প্রাণীর পরিসংখ্যান তৈরী করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে জরিপ (Base-line survey) সম্পন্ন করতে হবে। পরিসংখ্যানে ভ্যাক্সিন প্রদানের তথ্য, প্রাণীর বয়স, আনুমানিক শুমারী (প্রতি বছর পশুর জন্ম, মৃত্যু, ক্রয়, বিক্রয়, জবাই ইত্যাদির কারণে স্থিতির পরিমাণ) রোগ সংক্রমণের প্রবণতা বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

এক্ষেত্রে নির্বাচিত এলাকার চারদিকে সম্ভব হলে ১ কি.মি ব্যাপী সংবেদনশীল প্রাণীকে অতিরিক্ত ভ্যাক্সিন প্রদান করে বাফার জোন (Buffer) তৈরী করতে হবে এবং সম্পূর্ণ নজরদারীতে আনতে হবে।

২। মানসম্পন্ন গবেষণাগার নির্বাচন : ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগটি দ্রুত সনাক্ত করা এবং সিরোটাইপ নির্ণয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত পৃথক করে রোগ বিস্তারে বাধা দেয়া যায়। এছাড়াও প্রাণী দেহে এন্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয়, সংগ্রহকৃত নমুনা সংরক্ষণ, যথাযথভাবে নমুনা পরিবহন, ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবলসহ মানসম্পন্ন গবেষণাগারও আবশ্যক। অতএব মডেলটি বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকার নিকটস্থ সরকারী প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষুরারোগের রেফারেন্স গবেষণাগারের (BLRI) সাথে আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণাগারের (FDIL/CDIL)

চিত্র: গবেষণাগারের কার্যক্রম

চিত্র: ক্ষুরারোগ গবেষণাগার

সমন্বয় রাখতে হবে। গবেষণাগারে ক্ষুরারোগের উপর দক্ষ গবেষক বা বিজ্ঞানী থাকতে হবে। তাছাড়া, ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ও বিরাজমান ভাইরাসের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ণয় করার জন্য গবেষণাগারের সহায়তা প্রয়োজন।

৩। ক্ষুরারোগের মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন সংস্থান করা : ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটির প্রধান উপকরণ হলো ক্ষুরারোগের মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন। প্রাণী জরিপের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিনের সঠিক হিসাব ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র: ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন

৪। প্রশিক্ষিত প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরী : মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী প্রয়োজন হবে। প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মীবৃন্দ প্রাণীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, ভ্যাক্সিন প্রদান, কৃমিনাশক প্রদান, স্বাস্থ্য-কার্ড পূরণ, রোগের প্রাদুর্ভাব রেকর্ড ও অন্যান্য প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে। অতএব পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরী করতে হবে।

চিত্র: প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী

৫। জনসচেতনতা তৈরী : জনসচেতনতা তৈরী করার জন্য খামারীদের মাঝে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রচার মাধ্যম ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সহায়তায় খামারীদের ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল

OIE এর নির্দেশনা অনুসরণ করে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল বাস্তবায়নে ৫টি ধাপ রয়েছে। মডেলটির প্রতিটি ধাপের জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে।

ধাপ-০: শূন্য পর্যায় (তথ্যবিহীন পর্যায়)

ক্ষুরারোগ সম্বন্ধে যখন কোনো দেশে বা অঞ্চলে কোনো তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে না বা এ বিষয়ে খুব সামান্য তথ্য আছে এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই, এমন পর্যায়টিকে ধাপ শূন্য বলা হয়।

ধাপ-১: (ইপিডেমিওলজিক্যাল জরিপ পর্যায়):

ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপ-এর মাধ্যমে, নির্বাচিত অঞ্চলের ক্ষুরারোগের ঝুঁকি সনাক্ত ও প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। জরিপের সময় বছরের কোন্ সময় এ অঞ্চলে ক্ষুরারোগ-এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, রোগটির কোন্ সিরোটাইপ পাওয়া যায়, কী সংখ্যায় প্রাণী সংক্রমিত হয়, কোন্ জাতের প্রাণী বেশী সংক্রমিত হয় ও কী সংখ্যায় প্রাণী মারা যায় তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। খামারী ভ্যাক্সিন দেয় কিনা, দিলে বছরে কতবার দেয়, চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত কিনা, রোগ সনাক্তকরণের জন্য ল্যাব আছে কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

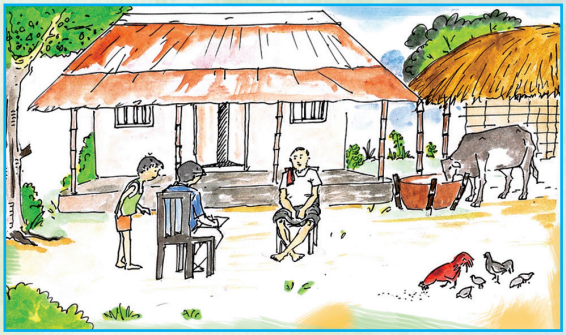

চিত্র: জরিপের জন্য খামারীর সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব

চিত্র: ওআইই (OIE) নির্দেশিত ধাপগুলি

এই ধাপটিতে ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপ ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

ক) একটি বেজলাইন জরিপ চালাতে হবে। যার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ হবে
খ) ক্ষুরারোগ সম্পর্কে খামারী ও এলাকাবাসীর ধারণা জানতে হবে
গ) কৃমি মুক্তকরণ ও ভ্যাক্সিন প্রদান সম্বন্ধে খামারীরা কতটুকু সচেতন তা জানতে হবে
ঘ) গবাদিপ্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কোন্ মানের তা জানতে হবে

ধাপ-২: ঝুঁকি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়-

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকার দূর্বল বিষয়গুলো সনাক্ত করে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে মডেলটি বাস্তবায়ন সহজতর হবে। বিএলআরআই-এর গবেষণায় দেখা যায় প্রধান ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) দূর্বল ভেটেরিনারি পরিসেবা (২) ভ্যাক্সিন সরবরাহে অপ্রতুলতা (৩) রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারীদের অজ্ঞতা (৪) ক্ষুরারোগ-এর সিরোটাইপ-এর সিরোটাইপ অজানা (৫) অনিয়ন্ত্রিতভাবে গবাদি প্রাণী চলাচল করা এবং (৬) যখন তখন প্রাণী ক্রয় ও বাজারজাত। সনাক্তকৃত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(১) দুর্বল ভেটেরিনারি পরিসেবা : মডেল এলাকার ভেটেরিনারী পরিসেবা উন্নত করার জন্য গবাদিপশুর সংখ্যা অনুপাতে প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরী করতে হবে। এ সকল প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, কৃমিনাশক প্রদান, ভ্যাক্সিন প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং ভেটেরিনারিয়ানকে সহযোগিতা করার বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে।

২) ভ্যাক্সিন সরবরাহে অপ্রতুলতা : নির্ধারিত এলাকার গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। সকল সংবেদনশীল দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীকে বছরে দুইবার ভ্যাক্সিন দিতে হবে। ভ্যাক্সিন দেয়ার ৪ সপ্তাহ পরে আনুপাতিক হারে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ভ্যাক্সিন-এর কার্যকারিতা (এন্টিবডির মাত্রা) যাচাই করতে হবে। ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাক্সিন প্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারীদের অজ্ঞতা : রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারীদের সহযোগিতা খুবই দরকার। খামারের জীব নিরাপত্তা, নিয়মিত সংক্রামক রোগের ভ্যাক্সিন দেয়া

এবং তথ্য সংগ্রহ করা, খামারের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে খামারীদের সচেতন করতে হবে। খামারীকে প্রশিক্ষিত প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী বা নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) ক্ষুরারোগ-এর সিরোটাইপ সনাক্ত করা : ক্ষুরারোগের বিরাজমান ভাইরাসের টাইপ নির্ণয় করে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। এর জন্য মডেল এলাকায় ক্ষুরারোগ-এর নমুনা সংগ্রহ করে এর সিরোটাইপ সনাক্ত এবং জিন সিকোয়েন্স করে ভ্যাক্সিন নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে ভ্যাক্সিন থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে।

(৫) নতুন সংগ্রহ করা প্রাণীর সংগনিরোধ এবং আক্রান্ত প্রাণী পৃথকীকরণ

নতুন সংগ্রহ করা প্রাণীকে প্রথমে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগনিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ষুরারোগ দমন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণী সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। যে সকল খামারী কোনো কারণে এলাকায় সংবেদনশীল প্রাণী আনতে চায় অথবা কোনো কারণে কোনো খামারে ক্ষুরারোগ বা অন্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তখন রোগাক্রান্ত প্রাণীকে দ্রুত এই স্থানে সংগনিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত প্রাণীটিকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন সংগ্রহ করা সংবেদনশীল প্রাণীর সংগনিরোধকালীন সময় প্রাণী আনার পরই কৃমিনাশক দিতে হবে এবং ৭ দিন পর্যবেক্ষণ করে যদি কোনো রোগ লক্ষণ না দেখা দেয় তবে ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন

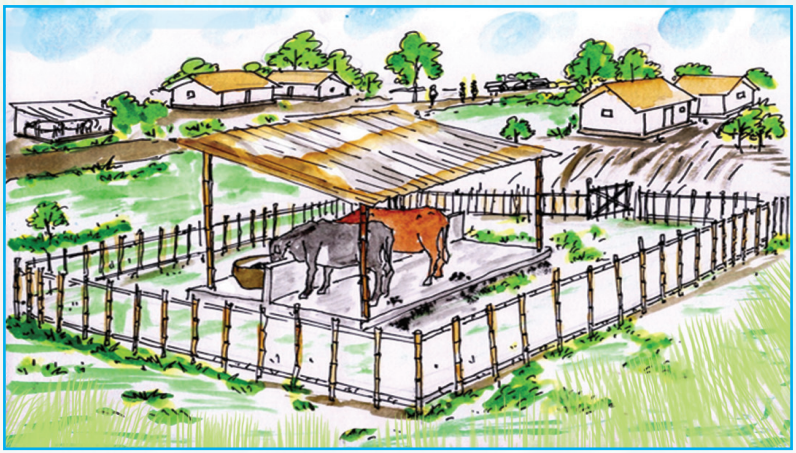

চিত্র: সংগনিরোধে রাখা প্রাণী

দিয়ে পরবর্তী ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যবেক্ষণ করে সুস্থ অবস্থায় প্রাণীকে মূল খামারে স্থানান্তর করতে হবে। সংগনিরোধ করার জন্য স্থান নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এলাকাটিতে প্রাণী চলাচল কম থাকে এবং মূল খামার থেকে দূরে হয়। এর ফলে নতুন সংগ্রহ করা প্রাণী হতে ক্ষুরারোগমুক্ত অঞ্চলে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। আক্রান্ত প্রাণীকে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। দক্ষ জনবল তৈরি করা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী, যথাযথভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে রোগ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

৭। খামারী প্রশিক্ষণ

চিত্র: খামারী প্রশিক্ষণ

আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারীর প্রাণিপালন ও রোগ দমন, পুষ্টির প্রাপ্যতা, জীব নিরাপত্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা কম। তাই রোগ-টি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমেই খামারীকে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত করতে হবে। উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরী যা মডেলটি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

৮। প্রাণিস্বাস্থ্য কার্ড প্রদান

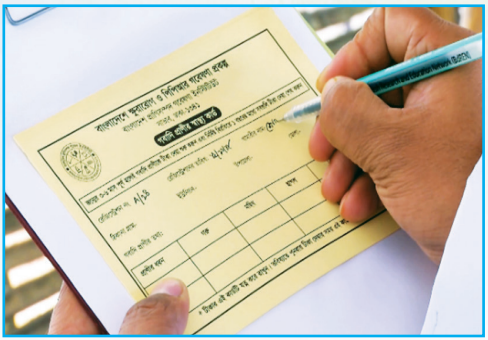

প্রাণীর জন্ম, কৃমিনাশক প্রদান, ভ্যাক্সিন প্রদানসহ অন্যান্য রোগবালাই ও চিকিৎসা প্রদানের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি খামারীকে গবাদিপ্রাণী স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে খামারী-গণ উপরোক্ত তথ্যাবলী লিপি-বদ্ধ করে রাখবেন।

ধাপ-৩: ক্ষুরারোগের গণভ্যাক্সিন (Mass Vaccination) প্রদান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়-

মূলত এই পর্যায়টি ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়। গণকৃমিনাশক প্রদান, গণভ্যাক্সিন প্রদান ও ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও পরে এন্টিবডির মাত্রা নির্ধারণ করে হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity) নিশ্চিত করা এই পর্যায়ের প্রধান কাজ। এছাড়াও ক্ষুরারোগের কোন্ সিরোটাইপের দ্বারা সংক্রমণ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১। বাফার জোন তৈরী

যে এলাকাটি ক্ষুরারোগমুক্ত মডেলের আওতায় থাকবে তার চারদিকে অন্ততপক্ষে এক কিলোমিটার এলাকার সকল গবাদিপ্রাণিকে কৃমিনাশক ও ভ্যাক্সিনেশন-এর আওতায় আনতে হবে। ধাপ-৩ শুরুর অন্ততপক্ষে ১ মাস আগে বাফার জোন তৈরী করতে হবে। বাফার জোনে ক্ষুরারোগের এন্টিবডি নিশ্চিত করতে হবে।

২। গণ কৃমিনাশক প্রদান

নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল প্রাণীকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর উপর বিস্তৃতভাবে কার্যকর কৃমিনাশক (Broad spectrum) প্রদান করতে হবে। প্রথমবার কৃমিনাশক দেয়ার পর ২১ দিন পর পুনরায় কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে পরজীবী সংক্রমণের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৪ মাস পর পর সকল প্রাণীকে কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। ফলশ্রুতিতে প্রাণীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং প্রদানকৃত ভ্যাক্সিন হতে ভাল এন্টিবডি পাওয়া যাবে।

চিত্র: কৃমিনাশক প্রদান করার পদ্ধতি

চিত্র: খামারীকে কৃমিনাশক প্রদান করার পদ্ধতি

৩। গণভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই :

দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট দুই মাস বয়সের উর্ধ্বে সকল প্রাণীকে চামড়ার নিচে একবার ও ছয় মাস পর পর পুনরায় ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। সাধারণতঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঈদ-উল-আযহার এক মাস আগে উৎসবমুখর পরিবেশে গণভ্যাক্সিন প্রদান করলে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তাছাড়া, উক্ত এলাকায় নতুন ক্রয় করা প্রাণীকে

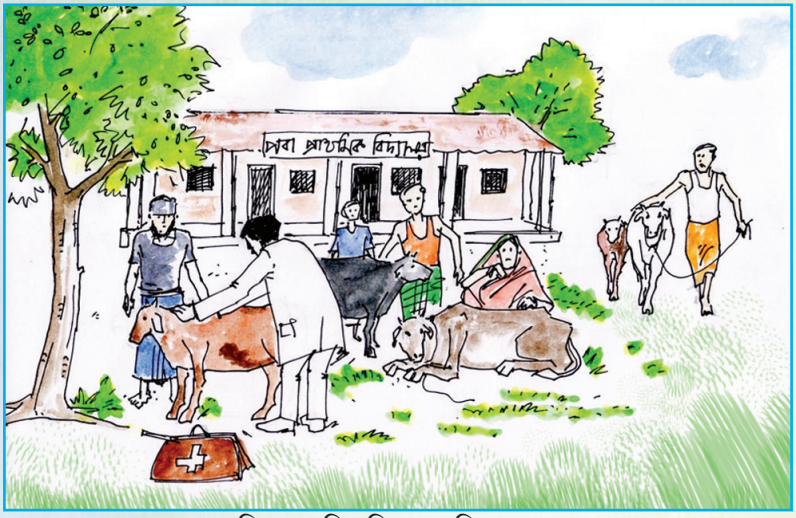

চিত্র: গবাদিপ্রাণিকে ভ্যাক্সিন প্রদান

একই নিয়মে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। ভ্যাক্সিন সব সময় ৪° ডিগ্রী সেঃ তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এর জন্য গবেষণাগারে বা সংরক্ষণাগারে ফ্রিজ এবং বিরতিহীন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন প্রাণীর বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে যাতে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান করা যায়।

৪। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই :

প্রাণীর সর্বমোট সংখ্যার উপর গড়ভিত্তিক একটি সিরোলজিক্যাল জরিপ করা প্রয়োজন। এখানে প্রাণীর ক্ষুরারোগ-এর বিরুদ্ধে এন্টিবডির পরিমাণ তথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করবে। ভ্যাক্সিন প্রদানের

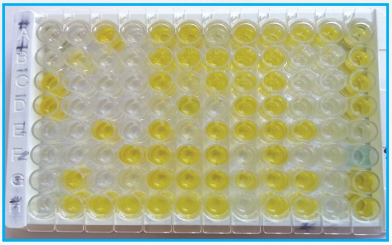

চিত্র: এলাইসা পদ্ধতিতে এন্টিবডি পরীক্ষা

পূর্বে ও ৪ সপ্তাহ পরে প্রাণী থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এলাইজা (ELISA) পদ্ধতিতে এন্টিবডির পরিমাণ দেখতে হবে। উক্ত এলাকায় ক্ষুরারোগের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ক্ষুরারোগ ও একই ধরনের অন্যান্য প্রাণিরোগ নির্ণয় :

মডেল এলাকায় ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও পরে ক্ষুরারোগের লক্ষণ প্রকাশকারী প্রাণী হতে নমুনা সংগ্রহ করে মলিকুলার পদ্ধতিতে (PCR) ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি উক্ত এলাকায় লক্ষণ প্রকাশকারী প্রাণীতে ক্ষুরারোগের ভাইরাসের উপস্থিতি না থাকে সেটিও ঘোষণা করতে হবে। মডেল এলাকায় ধাপ-৩-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব-এর কারণ উদঘাটন করতে হবে। এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করে সিরোটাইপ সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

৬। জীব নিরাপত্তা :

গবাদি প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খামারীদের মধ্যে জীব নিরাপত্তার ধারণাটি অস্পষ্ট। জীব নিরাপত্তার নিয়মকানুনগুলি মেনে কীভাবে খামার রোগ বালাই থেকে মুক্ত রাখা যাবে সে সব উপায়সহ মৃত প্রাণীর সৎকারের নিয়মগুলি খামারীদের জানাতে হবে। অচেনা নতুন প্রাণী এলাকায় আনার পূর্বে সংগনিরোধ করার পদ্ধতি খামারীকে অবগত করতে হবে। অসুস্থ প্রাণীকে বিক্রয় বা জবাই করা যাবে না।

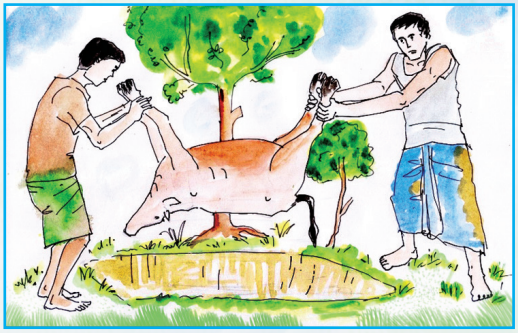

চিত্র: মাটিতে গর্ত করে মৃত প্রাণী সৎকার

৭। সাধারণ বিষয়াবলী :

রোগ দেখা দিলে খামারী কর্তৃক তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা, জরিপকারীদের ও নমুনা সংগ্রহকারীদের নিবিড় সহায়তা প্রদান, খামারীদের স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ (স্বাস্থ্য কার্ড) প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ পর্যায়ে যথাযথ ভ্যাক্সিন প্রদান করার পরে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এলাকায় পালিত সকল গবাদিপ্রাণীতে ক্ষুরারোগ-এর প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণভাবে রোধ করতে হবে। পরবর্তী ধাপে (৪নং ধাপে) উত্তীর্ণ হতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনায় নিতে হবে এবং সতর্কতার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পালন করতে হবে।

ক) সংক্রমিত এলাকা বা বাজার থেকে কোনো প্রাণী মডেল এলাকায় আনা যাবে না।

খ) যদি কোনো প্রাণীতে ক্ষুরারোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও যে কোনো রোগ দেখা দিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

গ) মডেল এলাকায় অবাধ প্রাণী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। জীবিত প্রাণী পরিবহন রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে।

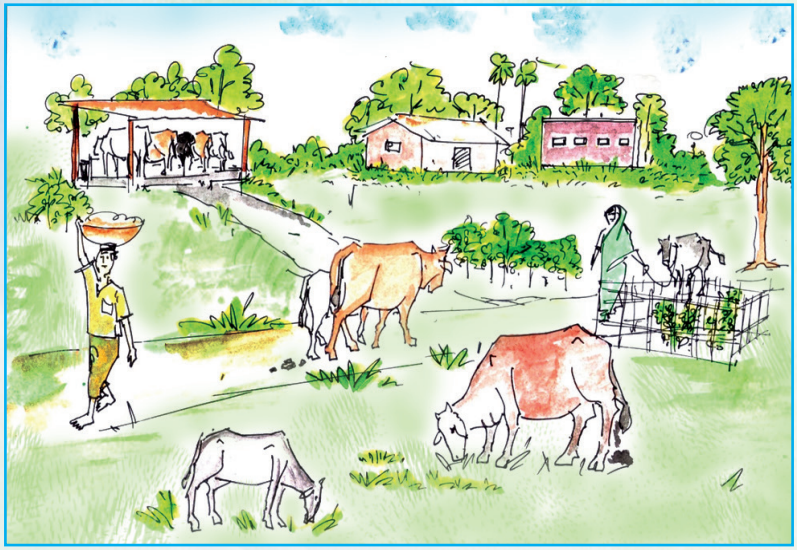

চিত্র: অবাধ প্রাণী চলাচল

ঘ) বিভিন্ন উৎসবের এক মাস পূর্বে এলাকার খামারীদের সতর্ক করতে হবে কারণ এ সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রাণী চলাচল বেড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) এলাকায় প্রাণীর প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথগুলিতে নজরদারী করতে হবে, যাতে কোনো রোগাক্রান্ত প্রাণী এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

চ) প্রাণী পরিবহন বাজারজাত করার সময় সনদপত্র সংরক্ষণ করার বিধান থাকবে।

ছ) গণভ্যাক্সিনেশনের পর প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

জ) খাদ্য সরবরাহ - প্রাণীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রাপ্যতা এবং খাবারের পরিমাণ ও পানির পরিমাণের বিষয়গুলি খামারীদের কাছে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

ঝ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : খামারে গবাদি প্রাণীর বিভিন্ন বর্জ্য যেমন, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, গোবর, মূত্র ইত্যাদি জীব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। এসব বর্জ্য একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে।

ধাপ-৪: ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা (ভ্যাক্সিনসহ) :

ধাপ ৩ (তিন) এর পরপর ন্যূনতম ৩ বছর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। প্রাণীর চলাচল কঠোর নজরদারীতে আনতে হবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। পরপর চার বছর হার্ড ইমিউনিটি (ভ্যাক্সিন প্রদানসহ) নিশ্চিত করতে হবে। ৪র্থ ধাপের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত করলে নির্বাচিত এলাকায় ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব শূন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

এ পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে যে ভ্যাক্সিন দেয়ার পর নির্বাচিত এলাকায় কোনো প্রকার ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা ঘটে নাই। এ পর্যায়টি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। এ ধাপটিকে বলা হয়, ভ্যাকসিন প্রদানসহ ক্ষুরারোগমুক্ত এলাকা (**FMD Free- zone with vaccination**)। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্য OIE-এর কাছে নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। OIE পর্যবেক্ষণ দল নীরিক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে "ভ্যাকসিন প্রদানসহ ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল" ঘোষণা করা যাবে।

ধাপ-৫: ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা (ভ্যাক্সিন ছাড়া) :

৪র্থ ধাপ-এর কার্যক্রম কয়েক বৎসর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর এই ধাপে পৌঁছানো যাবে। এ ধাপটি ভ্যাক্সিন প্রদান ছাড়া চূড়ান্তভাবে 'ক্ষুরারোগমুক্ত' থাকবে। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্যও OIE-এর কাছে নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। OIE পর্যবেক্ষক দল নীরিক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে চূড়ান্তভাবে " ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল ভ্যাকসিন ছাড়া" (**FMD Free zone without vaccination)** ঘোষণা দেয়া যেতে পারে। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ ধাপটিতে উত্তরণ করা কঠিন। কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। ৫ম ধাপে পৌঁছার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সমন্বয় করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার :

আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের (দুই ঈদ) সময় ও পরে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। অতএব বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের পূর্বে গবাদিপ্রাণীকে মানসম্পন্ন ত্রিযোজি ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে মাংস রপ্তানীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন, গবেষণাগার, সঠিকভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য দক্ষ জনবল এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে মডেলটি বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে মডেলটি বাস্তবায়ন করা হলে SDG এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের খামারী এবং বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঘাবাড়ীর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের সহায়তায় বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় উক্ত গ্রামের গরুতে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।